অ্যানোরেক্সিয়া নারভোসাঃ ওজন কমানো যখন রোগ!

ডাঃ মুনতাসীর মারুফ
সহকারী রেজিস্ট্রার, মানসিক রোগ বিভাগ
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
ই মেইল : **marufdmc@gmail.com**

বছর পাঁচেক আগের একটা খবর। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক তরুণী মডেলের মৃত্যু আলোড়ন তুলেছিল পুরো শোবিজ জগতেই। প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল আধুনিককালের 'সৌন্দর্য'-এর সংজ্ঞাও। মডেলিং জগতে চালু করতে হয়েছিল নতুন নিয়মেরও। খবরটি ছিল ব্রাজিলিয়ান এক তরুণীর মৃত্যুর। ২১ বছর বয়সী ঐ তরুণীর নাম আনা ক্যারোলিনা রেস্টন। কিডনী অকেজো হয়ে প্রায় ২০ দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর মারা যায় সে। চমকে দেয়ার মতো তথ্যটা হচ্ছে- ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চতার এই তরুণীর ওজন ছিল মাত্র ৪০ কেজি। স্বেচ্ছায় ওজন কমিয়ে সে নিজেকে নিয়ে এসেছিল এ অবস্থায়। প্রয়োজনাতিরিক্ত কৃশ হওয়া সত্ত্বেও তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, সে স্থূলকায় এবং এজন্য লোকজনের কাছে অনাকর্ষণীয় - যা তার মডেলিং ক্যারিয়ারের জন্য নেতিবাচক। তার মা পরে জানান, ওজন আরো কমানোর জন্য মরিয়া আনা খাওয়া-দাওয়া প্রায় করতোই না। তিনি মেয়েকে অস্বাভাবিক হারে শুকিয়ে যেতে দেখে কিছু বলতে গেলে মেয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠতো-'এ নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না, আমি ঠিকই আছি।' অ্যানার কাজিন ড্যানি গ্রিমালডি জানায়, যখন সে খাওয়া-দাওয়া করতো, খেত খুব কম পরিমাণে এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে বাথরুমে গিয়ে গোপনে বমি করে তা ফেলে দিত। ঐ সময় সে শাওয়ার ছেড়ে রাখতো যাতে বমির আওয়াজ বাইরে থেকে কেউ বুঝতে না পারে।

ক্রমাগত না খেয়ে থাকার জন্য তার শারীরিক অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটে। হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও তাকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

বিভিন্ন নামী মডেলিং এজেন্সীর হয়ে বিশ্বের নানা দেশে ঘুরে বেড়ানো এই তরুণীটি ভুগছিল খাদ্যাভ্যাসের অস্বাভাবিকতাজনিত একটি মানসিক রোগে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এ রোগটির নাম 'অ্যানোরেক্সিয়া নারভোসা'। বাংলায় একে 'স্বল্পাহারজনিত কৃশতা'ও বলা যায়। ঐ ২০০৬ সালেই উরুগুয়েতে ফ্যাশন-শোতে অংশ নেয়া অবস্থায় মারা যায় লুইজেল র‍্যামোস নামের ২২ বছর বয়সী এক মডেল। সেও ভুগছিল একই রোগে। আরও দুঃখজনক, তার মৃত্যুর মাত্র ছয় মাসের মাথায় একই রোগে ভোগা তার ১৮ বছর বয়সী বোন ইলিয়ানা রামোসও মারা যায়। সে-ও ছিল এক উঠতি মডেল। পরের বছর একই কারণে মারা যায় ইসরাইলী মডেল হিলা ইলমালিচ। এইসব অকাল মৃত্যুর ঘটনার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশে মডেলদের ন্যূনতম আদর্শ ওজন রক্ষার ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। এর চেয়ে কম ওজন হলে কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, এ রোগে ভুক্তভোগীর ৯০ শতাংশই নারী। নারীদের মধ্যে এ রোগের হার ০.৫ শতাংশ। তবে গবেষকরা এও বলেছেন, এ রোগে আক্রান্তের প্রকৃত হার নির্ণয় করা কঠিন, কারণ অনেকেই তাদের এ রোগ বা সমস্যাটি স্বীকার করতে চান না। যে কোন বয়সেই এ রোগ দেখা দিতে পারে। তবে, স্কুল-কলেজগামী অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের মধ্যেই এ রোগটি বেশী দেখা যায়। গবেষণায় দেখা যায়, রোগীদের ৪০ শতাংশেরই বয়স ১৫ থেকে ১৯ এর মধ্যে। মডেল, নৃত্যশিল্পী, অভিনেত্রী বা এসব পেশায় যেতে ইচ্ছুক অথবা অতিরিক্ত সৌন্দর্য সচেতন মেয়েদের মধ্যে খাদ্যাভ্যাসের অস্বাভাবিক এই প্রবণতা বেশী। মেয়েদের তুলনায় কম হলেও, ছেলেরাও এ রোগে আক্রান্ত হয়। ২০০৮ সালের মার্চ মাসে, এই রোগে আক্রান্ত হয়ে রোজমেরী পোপ নামের এক ব্রিটিশ ভদ্রলোকের মৃত্যু ইংল্যান্ডে আলোড়ন তোলে। তিনি সেখানকার এক ইউনিভার্সিটির সিনিয়র লেকচারার ছিলেন।

অ্যানোরেক্সিয়া নারভোসায় আক্রান্ত রোগীদের ন্যূনতম স্বাভাবিক ওজনও বজায় থাকে না, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই সে ওজন বজায় রাখে না। বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী আদর্শ যে ওজন হওয়া উচিত, তার ৮৫%-এরও কম হয় এদের ওজন। অর্থাৎ, বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী যার ন্যূনতম ৬৫ কেজি ওজন হওয়া উচিত, তার ওজন হয় ৫৫ কেজিরও কম। অন্যভাবেও হিসাবটি করা যায়। আদর্শ স্থূলত্ব মাপার একটি একক হচ্ছে বিএমআই (বডি মাস ইনডেক্স)। উচ্চতা আর ওজনের অনুপাতিক হিসাব করে বের করা হয় বিএমআই। স্বাভাবিক বিএমআই ধরা হয় ২০ থেকে ২৫। আর এই রোগে আক্রান্তদের বিএমআই হয় ১৭.৫ এর কম। রোগীরা স্বেচ্ছায় ওজন কমায়। নানা অজুহাতে খাবার এড়িয়ে চলে। ওজন কমানোর জন্য তারা শুধু যে কম খাবার গ্রহণ করে তা নয়, অনেকে খাওয়ার পর পর গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে খাবার ফেলেও দেয়। অতিরিক্ত ব্যায়াম করা ছাড়াও অনেকে এমন সব ওষুধ খায় যা অতিরিক্ত মল-মূত্র তৈরী করে শরীর থেকে খাবার ও পানি বের করে দেয় অথবা খাবারে অরুচি ধরায়।

নিজের দেহের আকৃতি ও ওজন সম্পর্কে এসব রোগীর ভুল ধারণা থাকে। প্রয়োজনাতিরিক্ত কৃশ হওয়ার পরও এরা নিজেদের মোটা বলেই মনে করে। আশেপাশের লোকজন বুঝতে পারে, রোগীর দেহের ওজন আগের চেয়ে অনেকখানি কমে গেছে। কিন্তু রোগীরা সেটা মানতে চায় না, তাদের লক্ষ্য থাকে আরও ওজন কমানো। সব সময় তারা ওজন বেড়ে যাওয়ার আশংকায় ভুগতে থাকে। তারা মনে করে, খাবার ব্যাপারে তারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে। ওজন নিয়ন্ত্রণই তাদের কাছে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার শামিল। ওজন নিয়ন্ত্রণের উপরই যেন তাদের জীবনের সার্থকতা। ওজন কমে যাওয়ার ফলে যে ভয়াবহ শারীরিক সমস্যা হতে পারে, তা তারা মানতে চায় না।

অ্যানোরেক্সিয়া নারভোসার রোগীদের অনাহারজনিত নানা জটিলতা দেখা দেয়। শরীরের ভেতরকার রাসায়নিকের সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হয়। পটাসিয়াম কমে যায়, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফেটসহ অন্যান্য ইলেকট্রোলাইটের পরিমাণেও তারতম্য ঘটে, কর্টিসেলের পরিমাণ বৃদ্ধি সহ হরমোনের অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে, দুর্বলতা, ক্লান্তি, মাথাব্যথা, খাদ্যনালীর গন্ডগোল, কোষ্ঠকাঠিন্য, ত্বকের শুষ্কতা, খিঁচুনী প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। নাড়ির গতি ও রক্তচাপ কমে যায়। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। শরীরের নানা জায়গায় নতুন রোম গজায়। ঠান্ডা সহ্য হয় না। গোড়ালী ও চোখের চারদিকে পানি জমে ফুলে যায়। হাড়ের প্রয়োজনীয় উপাদান ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি কমে গিয়ে হাড়ের ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায়। ৩৮-৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে হাড়ক্ষয়জনিত রোগ অস্টিওপোরোসিস দেখা দেয়। রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। দীর্ঘমেয়াদে এসব

চলতে থাকলে রোগীর কিডনী অকেজো হয়ে যায়, হৃৎযন্ত্রের সমস্যা দেখা দেয়। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। এ রোগে আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুর হার ৬ শতাংশ।

মেয়েদের ক্ষেত্রে, হরমোনের গন্ডগোলের কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে যায়। বয়ঃসন্ধিকালের আগে বা শুরুর দিকে এ রোগ হলে রোগীর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এছাড়া রোগী বিষণ্নতাসহ নানা মানসিক সমস্যায় ভোগে। মেজাজ খিটখিটে হয়। নিজের উপর আস্থা কমে যায়। যৌন বিষয়ে আগ্রহ কমে যায়। আত্মীয়-বন্ধুদের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অনেকে ভোগে খুঁতখুঁতে-স্বভাবজনিত রোগ অবসেসিভ-কমপালসিভ ডিজঅর্ডারে। কেউ বা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। এ রোগীদের মধ্যে আত্মহত্যা-প্রবণতা অন্যদের চেয়ে বেশী থাকে।

এ রোগের জন্য গবেষকরা বহুবিধ কারণকে দায়ী করেছেন। কারণগুলোকে শারীরিক (বায়োলজিক্যাল), মনস্তাত্ত্বিক (সাইকোলজিক্যাল), সামাজিক (সোস্যাল)- এভাবে ভাগ করা যায়। বায়োলজিক্যাল কারণগুলোর মধ্যে জিনগত কারণ অন্যতম। বংশানুক্রমিকভাবে জিনবাহিত হয়ে এ রোগ হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, সহোদর ভাইবোনের মধ্যে একজনের এ রোগ হলে অন্যজনেরও ঐ একই রোগে ভোগার আশংকা অন্যদের চেয়ে বেশী। মস্তিষ্কের কিছু রাসায়নিক উপাদান, যাকে নিউরোট্রান্সমিটার বলা হয়, তার কোন কোনটির অস্বাভাবিকতার কারণে এ রোগ হতে পারে। এ রোগে 'সেরোটোনিন' নামের একটি নিউরোট্রান্সমিটারের পরিমাণ ও গুণগত মানের তারতম্য দেখা গেছে গবেষণায়।

এ রোগের পেছনে সামাজিক কারণ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যেসব সমাজে 'স্লিম' মেয়েদেরকে সৌন্দর্যের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, সেসব স্থানে মেয়েরা এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও গ্ল্যামারের এই যুগে বিশ্বব্যাপীই এ ধারণা প্রচলিত যে, মেয়েদের আকর্ষণীয় দেখানোর জন্য অবশ্যই কৃশ-আকৃতির শরীর হতে হবে। অস্বাভাবিক ধরণের পাতলা মেয়েদের সৌন্দর্যের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে মিডিয়ায়। এর প্রভাবে পশ্চিমা বিশ্বের গন্ডি ছাড়িয়ে এ রোগ এখন ছড়িয়ে পড়ছে তৃতীয়-বিশ্ব বলে পরিচিত দেশগুলোতেও। আবার, কিছু কিছু পরিবারে খাদ্যকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়ায় বাবা-মার নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবেও অনাহারকেই বেছে নেয় অনেকে। 'ওভার-প্রোটেকটিভ' ও অতি কড়া বাবা-মার সন্তানদের এ রোগ হতে পারে। ভেঙে যাওয়া পরিবারের সন্তানদের মধ্যে এ রোগে ভোগার হার বেশী। ছোটবেলায় যারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তাদের মধ্যেও এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অন্যদের চেয়ে বেশী। মনস্তাত্ত্বিক কারণের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানীরা বলেন, যাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব পরিলক্ষিত হয় বেশী, তাদের এ রোগের আশংকাও বেশী। যারা খুবই 'পারফেকশনিষ্ট', তাদের মধ্যেও এ রোগ দেখা দিতে পারে। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন পর্যায়ে গঠন ঠিকমতো না হলে এ রোগ হতে পারে।

ইন্টারনেটও এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলছে। একই ধ্যান-ধারণার অনুসারী নারীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারছে, গড়ে তুলছে তাদের নিজস্ব 'কমিউনিটি'। সমাজের মূলস্রোতের লোকজন তাদের ধ্যানধারণার সমালোচনা করতে পারে, কিন্তু নিজস্ব বলয়ে এদের এ আশংকাটি থাকে না। তারা খাদ্যাভ্যাসজনিত এ অস্বাভাবিকতা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অস্বীকার করে এটিকে একটি 'লাইফস্টাইল চয়েজ' হিসেবে প্রচারণা চালায়। এভাবে পরস্পরের সহযোগিতা ও প্রেরণায় রোগীরা তাদের এ অস্বাভাবিকতা বজায় রাখে।

এসব রোগী তাদের রোগের ব্যাপারটিকে মানতে চায় না বলে চিকিৎসা নিতেও খুব একটা আগ্রহী হয় না। যাদের শারীরিক অবস্থা গুরুতর, ওজন বিপদজনকমাত্রায় কম বা ওজন হ্রাসের হার খুব দ্রুত অথবা যাদের মারাত্মক বিষণ্নতা ও আত্মহত্যা প্রবণতা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হাসপাতালে ভর্তি করানো প্রয়োজন হতে পারে। তবে অবশ্যই তা মানসিক স্বাস্থ্য আইন লংঘন না করে। আর রোগী নিজ থেকেই চিকিৎসা নিতে ইচ্ছুক হলে বা রোগীকে প্রথমেই চিকিৎসার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা গেলে হাসপাতালে ভর্তি না করিয়েও চিকিৎসা সম্ভব। এ রোগের চিকিৎসার প্রথম ধাপটি হচ্ছে রোগীকে সঠিক ওজনে ফিরিয়ে আনা। এ জন্য খাবার গ্রহণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। মুখে খাওয়ানো সম্ভব না হলে শিরাপথে স্যালাইন দেওয়া হয়। অনাহারজনিত কোন শারীরিক জটিলতার সৃষ্টি হলে তার চিকিৎসা করা হয়। শরীরে ইলেকট্রোলাইট, ভিটামিন প্রভৃতির ঘাটতি পূরণের পর ধাপে ধাপে রোগীর ওজন বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত প্রতি সপ্তাহে ০.৫ থেকে ১ কেজি করে ওজন বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। এভাবে ৮ থেকে ১২ সপ্তাহে ওজন মোটামুটি আদর্শ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। রোগীর খাদ্যগ্রহণ সেবিকা বা দায়িত্বশীল কারো প্রত্যক্ষ তত্ত্বাধানে করা ভালো। সেবিকা একদিকে রোগীকে আশ্বস্ত করার কাজ করেন, অন্যদিকে লক্ষ্য রাখেন যাতে রোগী খাওয়ার পর বমি করে তা উগড়ে না দেয়। তবে, ওজন বাড়ানোর এ লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করার আগে রোগীকে চিকিৎসাব্যবস্থার পুরো ধাপটি ব্যাখ্যা করে রোগীর আস্থা অর্জন করে নিতে হয়। চিকিৎসকের উপর রোগীর আস্থা ও বিশ্বাসের উপর চিকিৎসার সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে সাইকোথেরাপীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। 'সাপোর্টিভ সাইকোথেরাপী'র মাধ্যমে রোগীকে সহানুভূতির সঙ্গে উৎসাহ দিয়ে তার আস্থা অর্জন করা যেতে পারে। এছাড়া ধারণা পরিবর্তনকারী চিকিৎসার (কগনিটিভ থেরাপী) মাধ্যমে দৈহিক আকৃতি, ওজন ও খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে রোগীর ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করা হয়। রোগটি সম্পর্কে রোগীর পাশাপাশি রোগীর পরিবারকেও বিস্তারিত জানিয়ে সচেতন করা হয়। বিষণ্নতায় আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট জাতীয় ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। সুইডিশ গবেষকদের তথ্যমতে, এ রোগে আক্রান্তদের ৪০ শতাংশ চিকিৎসার মাধ্যমে পুরোপুরি ভাল হয়ে যায়, ৩৫ শতাংশের লক্ষণীয় উন্নতি হলেও রোগের কিছু লক্ষণ থেকে যায়, বাকী ২৫ শতাংশের দীর্ঘমেয়াদে তেমন কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না।

এ রোগে মৃত্যুর উদাহরণ যেমন আছে, তেমনি এ রোগকে পরাজিত করে স্বাভাবিক জীবনযাপনের কাহিনীও বিরল নয়। 'স্পাইস গার্লস'দের অন্যতম গ্যারি হলওয়েল, ভিক্টোরিয়া বেকহাম, 'টাইটানিক'-এর অভিনেত্রী কেট উইনস্লেট, অভিনেত্রী জেন ফন্ডাসহ অনেক নামী-দামী তারকাই স্বীকার করেছেন তাদের এ রোগে ভোগার কথা। চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ থেকে মুক্তও হয়েছেন তারা। আমাদের দেশে মডেলিং বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, আগের চেয়ে অধিক হারে শোবিজ জগতে পদচারণা বাড়ছে নারীর। জনপ্রিয় হয়ে উঠছে 'জিরো ফিগার' ধারণাটিও। আধুনিক অনেক তরুণীর কাছে নারীর আদর্শ দৈহিক কাঠামো সংজ্ঞায়িত হচ্ছে নতুনভাবে। ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশেও এ রোগে নারীদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। তবে রোগটি সম্পর্কে সচেতনতা কম বলে রোগীদের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার হারও কম।